হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেনের মেয়ে

বিজলি সরকার

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশাসনে হরপ্রসাদকে উপন্যাস লেখা একরকম ছেড়েই দিতে হয়েছিল। বিশ্ব-খ্যাত এই ভারততত্ত্ববিদের লেখক জীবনের সূচনা হয়েছিল *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজ থেকে সদ্য বি.এ. পাশ হরপ্রসাদকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদের *ভারতমহিলা* প্রবন্ধটির গদ্যশৈলী বঙ্কিমকে মুগ্ধ করেছিল। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় *ভারতমহিলা* ছাপা হয়। এরপর হরপ্রসাদ *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার একজন অন্যতম লেখক হয়ে ওঠেন। বয়সের দিক থেকে হরপ্রসাদ ছিলেন *বঙ্গদর্শন*-এর কনিষ্ঠতম লেখক। ধীরে ধীরে বঙ্কিমচন্দ্রর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়ে ওঠে দৈনন্দিনের, আত্মীয়-পরিজনের মতো। হরপ্রসাদ বলতেন, বঙ্কিম ছিলেন তাঁর 'friend philosopher and guide'।

বঙ্গদর্শন পত্রিকায় হরপ্রসাদ মূলত প্রবন্ধই লিখতেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে *বঙ্গদর্শন*-এ তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা তেইশ। তাঁর প্রথম উপন্যাস *কাঞ্চনমালা বঙ্গদর্শন*-এ ধারাবাহিক বেরোয় (আষাঢ়-মাঘ ১২৮৯)। মোট দ্বাদশ খণ্ডে *কাঞ্চনমালা* শেষ হয়। এই সময়ে (১২৮৪-৮৯ বঙ্গাব্দ) *বঙ্গদর্শন*-এর সম্পাদক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসের পটভূমি বহু দূরাগত কালের বৌদ্ধ-ইতিহাস থেকে নেওয়া। বিষয়বস্তু সম্রাট অশোকের ছেলে কুণাল ও পুত্রবধূ কাঞ্চনমালার প্রেমভালোবাসা, বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রগাঢ় প্রণয় ও বৌদ্ধধর্মের প্রচার এবং বৌদ্ধধর্মের অবসান হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থান। মূল এই গল্পটির পাশে আর-একটি আখ্যান আছে *কাঞ্চনমালা*-য়। সম্রাট অশোকের দ্বিতীয় মহিষী তিষ্যরক্ষা সৎ ছেলে কুণালের প্রেমাসক্ত। কুণালের অপরূপ চোখের সৌন্দর্যে মুগ্ধ তিষ্যরক্ষা কুণালকে প্রেম নিবেদন করে। তথাগতের একনিষ্ঠ সাধক, পত্নীনিষ্ঠ কুণাল বিমাতার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে। প্রত্যাখ্যানের অপমান আর অতৃপ্ত প্রেমের দহনে তিষ্যরক্ষা প্রতিশোধ নিতে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কৌশলে কুণালকে বন্দী করিয়ে তার চোখ উপড়ে আনিয়ে তাকে পদপিষ্ট করে ব্যর্থপ্রেমের জ্বালা মেটায়। পরে সে উন্মাদ হয়ে যায় এবং কাঞ্চনমালার কৃপায় ভালো হয়ে নিজের তিষ্যরক্ষা নামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে।

।। দুই ।।

তিষ্যরক্ষার কুণালের চোখ উৎপাটন ও চোখ পদদলিত করার বর্ণনা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র বেজায় চটে যান। তিনি হরপ্রসাদকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, তুমি যদি এমন সব ভয়ানক ব্যাপার লেখ, তবে আমি তাঁর বিরুদ্ধে যাব। আমি অনেক প্রচেষ্টায় *বঙ্গদর্শন*-এর মধ্যে দিয়ে দেশের রুচি ফিরিয়েছি। তুমি কি সেই রুচির পরিবর্তন নষ্ট করে দিতে চাও? তাহলে আমি তোমার বিরুদ্ধে কলম ধরব। সাহিত্যগুরুর ধমক খেয়ে হরপ্রসাদ উপন্যাস লেখাই ছেড়ে দিলেন।

বঙ্গিমচন্দ্রর *বঙ্গদর্শন* বাঙালির চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তনের যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, তার কেন্দ্রে ছিল তাঁর নিজস্ব সাহিত্যাদর্শ। অটল সংকল্পে তিনি তাঁর সেই একান্ত প্রাতিস্বিক সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সাহিত্যের সামাজিক উপযোগিতাবাদকে তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

তাঁর অনুমোদিত সাহিত্য-নীতির অনুসরণ ভিন্ন *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর উপায়ও ছিল না। এই জায়গা থেকেই বঙ্কিম হরপ্রসাদের *কাঞ্চনমালা* পড়ে রেগে গিয়েছিলেন আর *বঙ্গদর্শন*-এর লেখকদের বাধ্যবাধকতা থেকেই হরপ্রসাদও বঙ্কিমকে চটিয়ে *কাঞ্চনমালা*-র মতো উপন্যাস আর লিখতে চাননি। *কাঞ্চনমালা বঙ্গদর্শন*-এ বেরোবার তেত্রিশ বছর পর গ্রন্থবদ্ধ হয় ১৩২২ বঙ্গাব্দে। বঙ্কিম বেঁচে থাকতে তিনি *কাঞ্চনমালা*-কে গ্রন্থে রূপ দিতেও সাহস পাননি। সাহস না পাবারই কথা। সে সময় সাহিত্যসম্রাটের প্রসন্নতা-অপ্রসন্নতার ওপর অনেক লেখকযশ-প্রার্থীদের সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া বা না পাওয়া অনেকখানি নির্ভর করতো। *বঙ্গদর্শন*-এ বঙ্কিমের সমালোচনার এক খোঁচায় বহু লেখকের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার যোগাড় হতো। *বঙ্গদর্শন*-এ গ্রন্থ সমালোচনা করে সে সময় বঙ্কিম বহু মানুষের কেমন শত্রু হয়ে উঠেছিলেন—সে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বঙ্কিমের আলাপচারিতায় (শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে) এবং রবীন্দ্রনাথসহ অনেকের লেখাতেই পাওয়া যাবে। আত্মবিকাশের সূচনা পর্বে বঙ্কিমের একটুখানি প্রশংসা পাবার জন্য কবিযশপ্রার্থী তরুণ রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের কাছে বারে বারে ছুটে যেতেন—সে কথা রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন একাধিক লেখায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *শিল্পী : চারু খান*

।। তিন ।।

বঙ্গদর্শন-এ *কাঞ্চনমালা* প্রকাশের ছত্রিশ বছর পর *বেনের মেয়ে* উপন্যাস প্রকাশিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত *নারায়ণ* পত্রিকায় (১৩২৫-এর কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩২৬-এর কার্তিক-অগ্রহায়ণ) মোট ১৪টি সংখ্যায় *বেনের মেয়ে* বেরিয়েছিল। ১৯১৯-এ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে *বেনের মেয়ে* বই হয়। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়নি। আর-একবার মাত্র ছাপা হয়েছিল বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে (১৯৩২-এ)। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় হরপ্রসাদ পত্রিকার বিন্যাসের প্রচুর রদবদল করেছিলেন। যেমন, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদটি বাদ দিয়েছেন। (১৯৮০-তে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ ১'-এ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ এবং অন্যান্য পরিবর্তিত অংশগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 'প্রাসঙ্গিক তথ্য'-এ। সম্পাদনা : সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)।

বেনের মেয়ে উপন্যাসের পটভূমি হাজার বছর আগের প্রাচীন বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের বৌদ্ধ ও হিন্দু অধ্যুষিত জনজীবনের সামাজিক ইতিবৃত্ত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের অবসান এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান এর মূল প্রতিপাদ্য। মূল এই বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হরপ্রসাদ ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনজীবনের চাষআবাদ-কারুশিল্প-ব্যবসাবাণিজ্য-শিল্পকলাচর্চা-স্থাপত্যকলা-বিদ্যাচর্চা—সব মিলিয়ে দুটি ধর্মের সমাজ বিন্যাসের এক ব্যাপক প্রেক্ষাপট তুলে আনেন তাঁর আখ্যানে। বণিক বিহারী দত্তের মেয়ে মায়াকে নিয়ে উপন্যাসের আখ্যাপত্র হলেও এই কাহিনী সে অর্থে কোনও নায়ক-নায়িকার গল্প নয়। সাতগাঁ, প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের শহর ও গ্রাম-গ্রামান্তর নিয়ে এক বৃহৎ ভূখণ্ডের জনজীবনের ইতিহাস এই গল্পের প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। হরপ্রসাদ দেশের ইতিহাস বলতে বুঝতেন জনসমাজের ইতিহাস। সাতগাঁর বৌদ্ধ রাজা রূপা বাগ্‌দীর রাজত্ব লোপ এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ হরিবর্মার রাজা হওয়ার ঘটনার মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ইঙ্গিত থাকলেও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বদল এ উপন্যাসে গৌণ ব্যাপার। রাজনৈতিক ক্ষমতা বদলের মূলে যে প্রবল সামাজিক শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কাজ করে—সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সমাজ-জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তুলে ধরাই ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য হয়ে ওঠে। সামাজিক ইতিহাসের একজন প্রগাঢ় গবেষক হিসেবে হরপ্রসাদ বুঝেছিলেন যে, কোনো রাজরাজড়ার কাহিনী, যুদ্ধ জয় পরাজয়ের কাহিনীতে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে না। দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সম্পর্ক কেমন করে ভাঙে-গড়ে, জাতপাতের টানাপোড়েনে, খাদ্যাভ্যাসের রুচি, বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক—জনজীবনের এই সমস্ত দিকের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ *বেনের মেয়ে*-র বড়ো সম্পদ। এ বিষয়ে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ'-এর সম্পাদক অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরীর মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য।

> বাঙলার বা ভারতের পুরাতন সমাজ কাঠামোয় দেশের ধনসম্পদ উৎপাদনের দিক থেকে জনজীবনের বিভিন্ন উপরিভাগ বৃত্তিগত 'জাতি'রূপে চিহ্নিত ছিল। তাই জনবৃত্তের পটভূমি রূপায়ণে সঙ্গতভাবে হরপ্রসাদ বৃত্তিগত জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের বুনট উপন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিফলিত করেছেন।...সামাজিক শক্তির টানাপোড়েনে ইতিহাসের গতি ও বাঁক ফেরার তাৎপর্য বোঝার এমন বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে শিল্পরূপের বাস্তবতায় প্রমূর্ত করার এমন দৃষ্টান্ত আমাদের সাহিত্যে বিরল।
>
> (*প্রতিহত ঔপন্যাসিক প্রতিভা : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী*, 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ', সম্পাদনা : সত্যজিৎ চৌধুরী ও অন্যান্য)

বেনের মেয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয় বলে মন্তব্য করেছেন স্বয়ং ঔপন্যাসিক। তিনি বইটির 'মুখপাত'-এ বলেছেন, "বেনের মেয়ে ইতিহাস নয়; সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞানসম্মত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না।... বেনের মেয়ে একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই।"

ইতিহাস না হলেও এই গল্পে প্রচুর ঐতিহাসিক ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছে। যেমন, লুই সিদ্ধা, যিনি চর্যাপদের (হরপ্রসাদের বিখ্যাত আবিষ্কার) প্রথম পদকর্তা লুইপাদ, হরিবর্মদেব, তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ভবদেব ভট্ট, প্রশস্তপাদ, পাণ্ডুদাস, বাচস্পতি মিশ্র, যোগ্লোক, মহীপাল, রাজা ইন্দ্রভূতি, বজ্রদত্ত, শান্তিদেব, রত্নাকর শান্তি, শ্রীহর্ষ, শ্রীহীর প্রভৃতি। এই সব ঐতিহাসিক চরিত্ররা সবাই সমসাময়িক সময়ের ব্যক্তি ছিলেন না। দীর্ঘকালে ব্যাপ্ত বাঙালি জীবনের গল্প *বেনের মেয়ে*-র মাত্র দুই দশকের সীমার মধ্যে ধরতে গিয়ে অনিবার্যভাবে উপন্যাসে কালাতিক্রমণ দোষ ঘটেছে। তবে এই ঐতিহাসিক বিচ্যুতিতে *বেনের মেয়ে*-র সাহিত্য মূল্য কমে যায় না।

উপন্যাস শুরু হয়েছে ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে, বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গাজনের উৎসব ও সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের রূপা রাজার ধরমপুর সঙ্ঘারামে বিহার প্রতিষ্ঠার মধ্যে। শেষ হয়েছে হিন্দু রাজা হরিবর্মার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং হরিবর্মার রাজসভায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কলাকার-

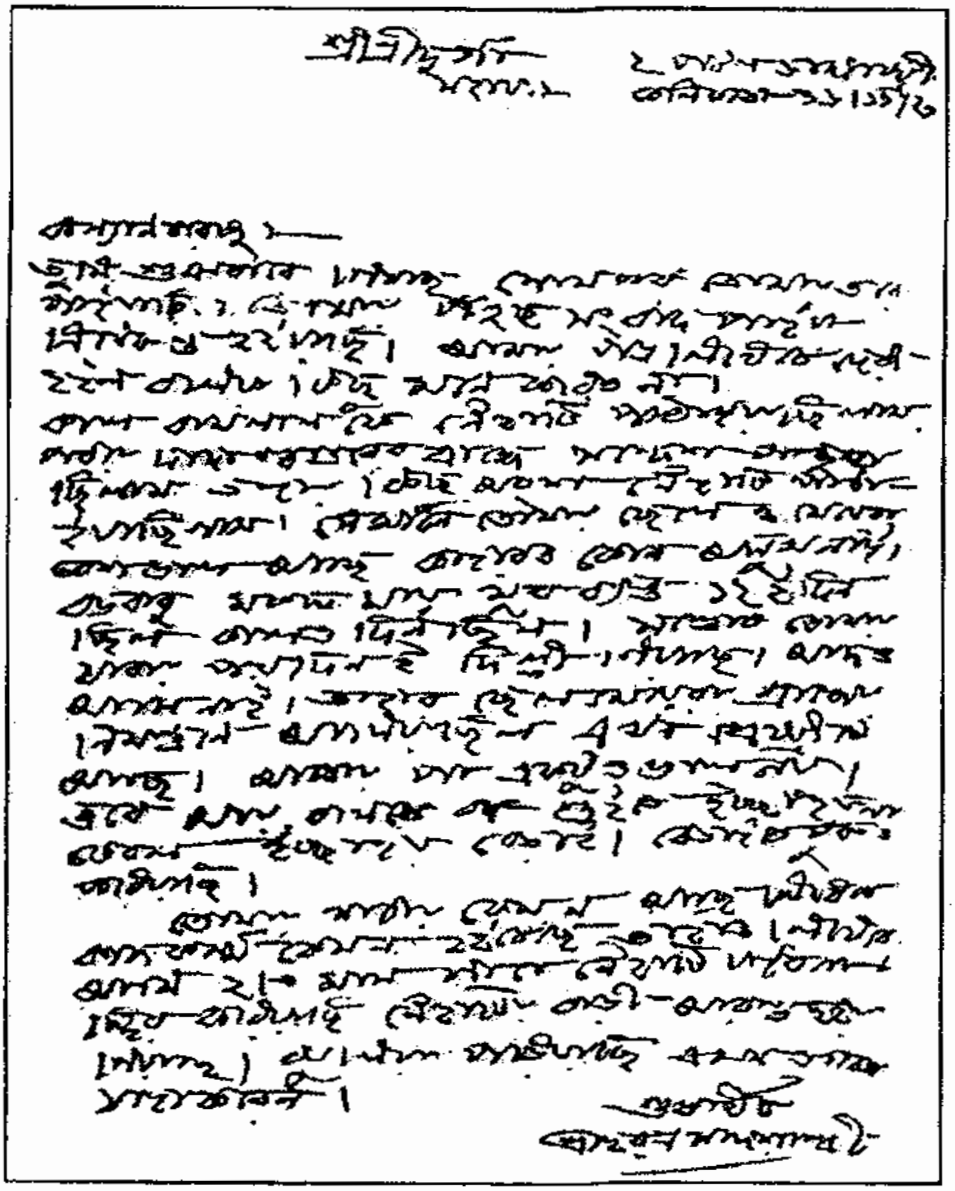

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা একটি চিঠির প্রতিলিপি

শিল্পীদের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে এবং বৌদ্ধ গুরুপুত্রের রাজসভায় ধিক্কৃত হয়ে সাতগাঁ ছেড়ে যাবার উদ্যোগে। সাতগাঁয়ে বৌদ্ধধর্মের হ্রাস এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান—এই ফ্রেমের মধ্যে হরপ্রসাদ যেভাবে গল্পের বিস্তার করেছেন তার পরিধি বিরাট। মূল গল্পের সঙ্গে আছে বেনে বিহারী দত্তের গল্প, মায়ার গল্প, গুরুপুত্র ও মস্করীর গল্প। মশলার বেনে বিহারী দত্তের অগাধ টাকা। কিন্তু তার মনে সুখ নেই। একমাত্র সন্তান মায়া বিয়ের চার বছর পরে বিধবা হয়। মায়ার স্বামী জীবন ধনী, যক্ষ্মারোগে মারা যায়। নিঃসন্তান মায়া বাবা ও শ্বশুরের বিপুল সম্পত্তি কী করে রক্ষা করবে ভেবে পায় না। বৌদ্ধ রাজা রূপা বাগ্‌দী ও বৌদ্ধবিহারের দলবল ষড়যন্ত্র করে মায়াকে অপহরণ করে বিহারে নিয়ে গিয়ে গুরুপুত্রের সাধনার যোগিনী করে দিলে মায়ার বিরাট সম্পত্তি বিহারের অধিগত হবে। এই ষড়যন্ত্রে জল ঢেলে দেয় মস্করী, যার আসল নাম পিশাচখণ্ডী; যিনি হিন্দু শাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত এবং চৌষট্টিকলায় দারুণ পটু। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর বেশে মায়াকে তার স্বামীর চিত্রদর্শন করবার কথা বলে গোপনে সরিয়ে নিয়ে যান। বৌদ্ধরা মায়াকে অপহরণ করেছে—এই সন্দেহে হিন্দু-বৌদ্ধের যুদ্ধ বেঁধে যায়। এই যুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি নিঃশেষ হয় এবং হিন্দু রাজত্বের সূচনা হয়। যদিও হিন্দুরা ধরমপুরের বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করেনি। কিন্তু ভারী রাজসভায় মায়ার উদ্দেশে কামনা উদ্রেককারী কবিতা পাঠ করে গুরুপুত্র তিরস্কৃত হন এবং তিনি বৌদ্ধবিহার ছেড়ে যাবার জন্য তৈরি হন। এই আখ্যানে উপন্যাস শেষ হয়।

।। চার ।।

হিন্দু-বৌদ্ধের ঝগড়া-অশান্তি এবং মায়াকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হলেও *বেনের মেয়ে* উপন্যাসে এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের সহাবস্থান, উভয় ধর্মের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস-ভক্তির কথাও বলা হয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নৈতিক অধঃপতন, চারিত্রিক স্খলন এবং লোভ ও কদাচারেই যে সাতগাঁয়ের বৌদ্ধ প্রভাব ধ্বংস হয়ে যায়—এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন গল্পকার। হরপ্রসাদের উপন্যাস নিয়ে তেমন কোনও আলোচনা এতাবৎ হয়নি। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর একটি মূল্যবান আলোচনা শোনার সুযোগ হয়েছিল আমাদের।

আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত হরপ্রসাদের ১২৮তম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে। ৬ ডিসেম্বর ১৯৮১-তে এই আলোচনা সভা হয়েছিল নৈহাটির শাস্ত্রী ভিলার আঙিনায়। এই সভার অন্য দুজন বক্তা ছিলেন ড. ভবতোষ দত্ত এবং অধ্যাপক পবিত্র সরকার। সমরেশ বসু হরপ্রসাদের *কাঞ্চনমালা* ও *বেনের মেয়ে* দুটো উপন্যাস নিয়েই আলোচনা করেছিলেন। *কাঞ্চনমালা* উপন্যাসের কাহিনী এবং তিষ্যরক্ষা চরিত্রটি আধুনিক পাঠকের কাছে কেন আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠবে, তুলনায় কাঞ্চনমালা কতটা সাদামাটা সমতল চরিত্র—যা আজকের পাঠকের তেমন আগ্রহ সঞ্চার করবে না—এ কথার তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শেষে সমরেশ বসু *বেনের মেয়ে*-র প্রসঙ্গে বলেন, "...'বেনের মেয়ে'-র কাহিনীর বাঁধুনি এত আশ্চর্য-সুন্দর এবং প্রতিটি জায়গায় কোথাও একটুও শৈথিল্য নেই। এবং 'বেনের মেয়ে' একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।" (সমরেশ বসুর বক্তব্যের অডিও রেকর্ডিং)।

হরপ্রসাদের এই দুটি উপন্যাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারক গ্রন্থ, আগের সূত্র)। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'উপন্যাসে অতীত'

(থীমা, ২০০৩) বইয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে হরপ্রসাদের এই দুটি উপন্যাস নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন।

হরপ্রসাদ সারাজীবনে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মাত্র দুটি উপন্যাস লিখেছেন। প্রথম উপন্যাসে ভাষা ও কাহিনী বুনটে বঙ্কিমের প্রভাব ছিল। কিন্তু অচিরেই তিনি সে প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। মনে রাখতে হবে হরপ্রসাদের মানস-চরিত্রের দুটি দিক। একদিকে তাঁর চলাচল বুদ্ধিমার্গে, মননের কঠিন পথে। তরুণ বয়স থেকেই তিনি মানববিদ্যা গবেষণায় আধুনিক পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন। সে পদ্ধতি পরিজ্ঞাত তথ্যের ইঙ্গিত অনুসরণ করে নতুন তথ্য আবিষ্কার, পুঞ্জিত তথ্য স্থির প্রতিপাদ্যের অনুকূলে সাজানো, তথ্য থেকে বক্তব্য ছেঁকে তোলা এবং প্রতিপাদ্য দৃঢ় সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া। অন্যদিকে এক শিক্ষিত রসরুচির বশে তাঁর সৃজন কল্পনা মুক্তি পায় আখ্যান-শিল্পে, *বাল্মীকির জয়*, *কাঞ্চনমালা*, *বেনের মেয়ে*-র মতো সৃজনে। এই রসরুচির বশেই কখনো কখনো তিনি লঘুচালে কৌতুকরসে ভরপুর প্রবন্ধ লিখেছেন।

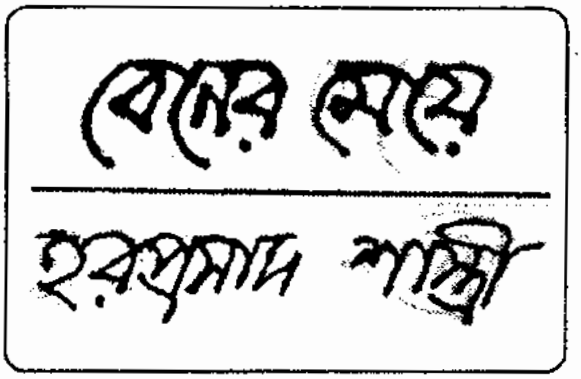

।। পাঁচ ।।

তাঁর উপন্যাসের প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে রাখা জরুরি। বিশেষ করে *বেনের মেয়ে* প্রসঙ্গে। ১৯১৯-এ যখন এটি প্রকাশিত হয়, তখন বাংলা উপন্যাস জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রবল প্রতাপ ছিল। *চোখের বালি* (১৯০৩), *নৌকাডুবি* (১৯০৬), *গোরা* (১৯১০), *ঘরে বাইরে* (১৯১৬), *চতুরঙ্গ* (১৯১৬) প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে গেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার ধারাও প্রায় বিলুপ্তির পথে। আধুনিক বিষয়নির্ভর উপন্যাসের এমন প্রবল দাপটের সময় হরপ্রসাদ *বেনের মেয়ে*-র মতো বহু দূরাগত কালের ইতিহাস নিয়ে আখ্যান লেখার সাহস পেলেন—এ কেবল তাঁর অসামান্য প্রাতিস্বিক মানস-চরিত্রের জন্য সম্ভব হয়েছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় *প্রবাসী* (মাঘ, ১৩৩০) পত্রিকায় *বেনের মেয়ে*-র ঐতিহাসিকতা নিয়ে যতই কটাক্ষ করুন না কেন, তাঁর সমালোচনার চার বছর আগে *সাহিত্য* পত্রিকায় *বেনের মেয়ে*-র সমালোচনায় বলা হয়েছে—

> মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' সেকালের বাঙ্গালার অতুলনীয় ছবি। সেকালের ইতিহাসই একালে উপন্যাসের মত। শাস্ত্রী মহাশয় নিপুণ তুলিকায় এই উপন্যাসে সেকালের ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন। বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্বে ইতিহাসে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তাঁহার সেই অভিজ্ঞান কল্পনায় প্রতিফলিত করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে অপূর্ব্ব বস্তুর সৃষ্টি করিতেছেন, আশা করি, তাহা সম্পূর্ণ হইলে, ফরাসী সাহিত্যের 'সালাম্বোর' মত বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে গৌরবের স্থান অধিকার করিবে।
>
> (উদ্ধৃতি 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ ১', আগের সূত্র)।